



নারী কর্মক্ষেত্রে: তাঁরা কিস্ত্যই হরে যায়, নাকি আমরা তাঁদের হারিয়ে ফলে?

লেখক: অনুভব রহমান | প্রকাশিত: 13 September 2026, 10:14 AM | বিভাগ: এইচআরএম



স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করা লক্ষ্য নারীর অদখো বাস্তবতা, সংগ্রাম, সম্ভাবনা, সাফল্য এবং মাঝপথে হারিয়ে যাওয়া নতেরত্বরে অপ্ৰকাশিত গল্প

নারীর কর্মজীবনের অদৃশ্য যুদ্ধ

যে বাধাগুলো আমরা দেখে, আর যে বাধাগুলো দেখতে চাই না “সবচেয়ে কঠনি বাধাগুলো সবসময় নীতমিলায় লখো থাকে না; সগেলো লুকিয়ে থাকে দৃষ্টিভিঙগতি, প্ৰত্যাশায় এবং নীরব বচারগুলোতে।”

প্ৰথম পর্বে আমি একটি প্ৰশ্ন রেখেছেলাম নারীরা কিস্ত্যই ক্যারিয়ার ছড়ে দেয়, নাকি আমিরা তাঁদের হারিয়ে ফলে? বশি বছররেও বেশি সময়রে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতায় আমি একটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবে দেখেছি অধিকাংশ নারী একদনি হঠাৎ করে চাকরি ছড়ে দনে না। তাঁরা ধীরে ধীরে ক্লান্ত হন।

ধীরে ধীরে পছিয়ে যান। ধীরে ধীরে নজিদেদের সম্ভাবনাকে ছোট করতে শুরু করেন। আর এই প্রক্রিয়াটি এতটাই নীরব যে অনেকে সময় প্রতিষ্ঠান, পরিবার, এমনকি সেই নারী নজিও বুঝতে পারেন না ঠিকি কোথায়, কীভাবে পরিবর্তনটা শুরু হয়েছিল। আমরা সাধারণত নারীর কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করতিন, যখন কটে চাকরি ছিড়ে দেন, পদত্যাগ করেন বা দৃশ্যমানভাবে পছিয়ে পড়েন। কিন্তু প্রকৃত গল্পটি অনেক আগে শুরু হয়। সেই গল্প শুরু হয় প্রতিদিনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতা থেকে। কখনো একটি মনস্তব্য়। কখনো পারিবারিক দ্বন্দ্ব, সন্দেহ বা অস্বস্তি কখনো একটি সিদ্ধান্ত। কখনো একটি সুযোগ না পাওয়া। কখনো একটি নীরব প্রত্যাশা। আর ধীরে ধীরে সেই অভিজ্ঞতাগুলো মিলে একজন নারীর আত্মবিশ্বাস, উচ্চাকাংক্ষা এবং ক্যারিয়ারের গতিপথকে বদলে দিতে শুরু করে।

আমার কাজের ধরনের কারণে আরেকটি বিষয় আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করছি। আমরা প্রায়ই নারীদের জিজ্ঞেস করি, “তারা কেন এগোতে পারছে না?” কিন্তু খুব কমই নজিদেদের জিজ্ঞেস করি “আমরা কি সত্যিই এমন কর্মপরিবেশে তৈরি করছি, যখনে তারা তাদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারে?” কারণ সব বাধা চোখে দেখা যায় না। কিছু বাধা থাকে আচরণে। কিছু থাকে মূল্যায়নের পদ্ধতিতে। কিছু থাকে সুযোগ বণ্টনের ধরনে। কিছু থাকে নীরব প্রত্যাশায়। আর কিছু থাকে সেই মানসিকতায়, যটেকি আমরা এতটাই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছি যে সটেকি আর বাধা বলেই মনে হয় না। সবচেয়ে জটিল বিষয় হলো এই বাধাগুলোর অধিকাংশই ইচ্ছাকৃত নয়। কটে সচেতনভাবে কাউকে পছিয়ে দিতে চায় না। তবুও প্রতিদিনের ছোট ছোট সিদ্ধান্ত, মনস্তব্য়, প্রত্যাশা এবং অদৃশ্য পক্ষপাত একসময় এমন একটি বাস্তবতা তৈরি করে, যখনে একজন নারীকে একই জায়গায় পৌঁছাতে অনেকে বেশি পথ পাড়ি দিতে হয়। আর সেই কারণেই নারীর কর্মজীবনের সবচেয়ে বড় যুদ্ধগুলো প্রায়ই দৃশ্যমান নয়। সেগুলো নীরব। কিন্তু তার প্রভাব গভীর।

সাধারণত আমরা দৃশ্যমান চ্যালেঞ্জ নিয়েই বেশি কথা বলি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নারী কর্মীদের কিছু সাধারণ চ্যালেঞ্জ নিয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি আলোচনা হয়। যমেন নিরাপত্তা, যাতায়াত ব্যবস্থা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি, বতেন বৈষম্য কিংবা নতৃত্বকে কম প্রতিনিধিত্বের মতো বাস্তব এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নঃসন্দেহে এসব সমস্যা নিয়ে কথা হওয়া প্রয়োজন। কারণ এগুলো বাস্তব। এগুলো পরিমাপ করা যায়। এগুলোর প্রভাব দৃশ্যমান। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় এগুলো পুরো গল্প নয়। কারণ সবচেয়ে বড় ক্ষত অনেকে সময় স্থানে তৈরি হয়, যখনে কোনো অভিযোগপত্র লখা যায় না। কোনো এইচআর রিপোর্ট সটে দেখায় না। কোনো এ্যামপ্লয়ী সার্ভে সটে পুরোপুরি ধরতে পারে না। তবুও সেই অদৃশ্য ক্ষতই একজন নারীর আত্মবিশ্বাস, উচ্চাকাংক্ষা এবং পেশাগত পরিচয়কে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। অনেকে সময় একটি মনস্তব্য়, একটি অনুমান, একটি উপেক্ষা কিংবা একটি অদৃশ্য প্রত্যাশা এমন প্রভাব ফেলে, যা কোনো নীতিমালা ভঙা করে না কিন্তু ধীরে ধীরে একজন মানুষের সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। আর ঠিক সেই কারণেই নারীর কর্মজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলোর অনেকেগুলো চোখে দেখা যায় না। তবুও সেগুলোর প্রভাব

দীর্ঘস্থায়ী। এবং অনেকে ক্ষেত্রে সেগুলোই নির্ধারণ করে দেয় কে নতৃত্বের পথে এগিয়ে যাবে, আর কে মাঝপথে থমে যাবে।

“নজিকে প্রমাণ করো” কনিত্তু কতবার?

কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সবচেয়ে বড় বৈপরীত্যগুলোর একটি হলো তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন সবসময় সরাসরি করা হয় না। অনেকে সময় সেই প্রশ্নগুলো লুকিয়ে থাকে দৃষ্টিভিঙারি ভেতরে, প্রত্যাশার ভেতরে এবং মূল্যায়নের ভেতরে। ফলে একজন নারীকে শুধু ভালো কাজ করলই হয় না; অনেকে সময় তাঁকে বারবার প্রমাণ করতে হয় যে তিনি সত্যিই সেই কাজের যোগ্য। একজন পুরুষ কর্মী ভালো কাজ করলে আমরা প্রায়ই ধরে নিই তিনি সক্ষম। কনিত্তু একজন নারী কর্মী একই ধরনের সাফল্য অর্জন করলে অনেকে সময় মন্তব্য আসে “সে সত্যিই একসপেশনাল।” প্রথম শুনতে এটি প্রশংসা মনে হতে পারে। কনিত্তু এর ভেতরে একটি সূক্ষ্ম বার্তা লুকিয়ে থাকে। যেন অসাধারণ হওয়াটাই তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা ছিল না। ফলে অনেকে নারীর কর্মজীবন এক ধরনের অবরাম প্রমাণের চক্রে পরণিত হয়। নতুন দায়িত্ব? নজিকে প্রমাণ করো। নতৃত্বের সুযোগ? নজিকে প্রমাণ করো। কঠনি প্রকল্প? নজিকে প্রমাণ করো। নতুন প্রতিষ্ঠান? নজিকে প্রমাণ করো। মাতৃত্বের পর কাজে ফিরিছে? আবার নজিকে প্রমাণ করো।

আমি বহু নারীকে দেখেছি, যাঁরা বছরের পর বছর ধারাবাহিকভাবে অসাধারণ কাজ করেছেন। তাঁদের সাফল্য দৃশ্যমান। তাঁদের অবদান পরিমাপযোগ্য। তাঁদের সক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। তবুও তাঁদের অনেকে মনে হয়েছে “আমাকে এখনও নজিকে প্রমাণ করতে হবে।” এই মানসিক কলান্তরি কোনো কপেআই নই। কোনো পারফরম্যান্স ড্যাসবোর্ড এটি দেখায় না। কোনো কোয়ার্টার্লি রিভিডি এটি পরিমাপ করে না। তবুও এই অদৃশ্য চাপই ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ক্ষয় করে, উচ্চাকাংক্ষাকে ছোট করে এবং অনেকে সম্ভাবনাময় মানুষকে নতৃত্বের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো এই ক্ষয়টি একদিনে ঘটে না। এটি ঘটে ধীরে ধীরে। নীরবে। কনিত্তু তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী।

একই আচরণ, ভিন্ন বচির, ভিন্ন দৃষ্টিভিঙারি

করপোরেটে বশির্ নজিকে নরিপক্ষে বলে দাবি করে। এবং বশেরিভাগ ক্ষেত্রেই সেই চেষ্টাও থাকে। কনিত্তু বাস্তবতা হলো, আমরা সবাই মানুষ। আর মানুষের সিদ্ধান্ত সবসময় শতভাগ পক্ষপাতমুক্ত হয় না। ফলে অনেকে সময় একই আচরণ, একই সিদ্ধান্ত কথিবা একই ধরনের নতৃত্বগুণ নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে মূল্যায়িত হয়। একজন পুরুষ দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করলে বলা হয় “স্ট্রং লডির।” একজন নারী একই দৃঢ়তা দেখালে বলা হয় “ঠু অ্যাগ্রসেডি।” একজন পুরুষ উচ্চাকাংক্ষী হলে বলা হয় “ক্যারিয়ার ফোকাসড।” একজন নারী উচ্চাকাংক্ষী হলে বলা হয় “ঠু অ্যাম্বিশি।” একজন পুরুষ নজিরে সাফল্যের কথা বললে বলা হয় “কনফিডেন্ট।” একজন নারী একই কাজ করলে কখনো কখনো বলা হয় “সলফ-প্রমোশনাল।” এই বচিরগুলো সাধারণত ইচ্ছাকৃত হয় না। বশেরিভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো আমাদের

অচতেন ধারণা, সামাজিক অভ্যাস এবং দীর্ঘদিনের মানসিক কাঠামো থেকে আসে। কিন্তু প্রভাবের দিক থেকে এগুলো মোটেও ছোট নয়। কারণ একজন মানুষ যখন বারবার অনুভব করেন যে তাঁর আচরণ অন্যদের তুলনায় ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, তখন তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে সংযত করতে শুরু করেন। তিনি কম কথা বলেন। কম দৃশ্যমান হন। কম ঝুঁকেন। কম দাবি করেন। আর অনেকে সময় অজান্তেই নিজের সম্ভাবনাকেও ছোট করে ফেলেন। ফলাফলটাই অত্যাশ্চর্য নীরব। কউে তাঁকে থামিয়ে দেয় না। কউে তাঁকে বলে না যে তিনি পারবেন না। তবুও একসময় তিনি সেই সুযোগগুলো থেকে দূরে সরে যান, যগুলো একদিন তাঁর নাগালের মধ্যেই ছিল। আর ঠিকি সেখানই আমরা বুঝতে পারি কখনো কখনো সবচেয়ে বড় বাধাগুলো দৃশ্যমান নয়, কিন্তু তাদের প্রভাব অত্যাশ্চর্য বাস্তব।

(চলবে)